بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৩ ডিসেম্বর ২০২২ মোতাবেক ২৩ ফাতাহ ১৪০১ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ থেকে কাদিয়ানের জলসা সালানা শুরু হচ্ছে আর অনুরূপভাবে আফ্রিকার কয়েকটি দেশেও জলসা সালানা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিটি দেশের জলসাকে সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন। ইনশাআল্লাহ্ আগামী রবিবার জলসার শেষ দিন কাদিয়ান জলসা উপলক্ষ্যে যে ভাষণ প্রদান করা হবে তাতে আফ্রিকার দেশগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে, ৭/৮টি দেশ রয়েছে। এছাড়া এমটিএ'র মাধ্যমে তাদেরকে এতে সরাসরি যুক্ত করে দেয়ারও চেষ্টা করা হবে।

যাহোক, এখন যেহেতু মানুষ এসব দেশে একটি স্থানে একত্রিত হয়ে খুতবা শুনছে আর মনোযোগ সহকারে শোনার একটি বিশেষ পরিবেশও বিরাজ করছে, তাই আমি সঙ্গত মনে করলাম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় সেসব বিষয় উপস্থাপন করি যাতে তাঁর আবির্ভূত হওয়ার উদ্দেশ্য এবং জামা'ত (প্রতিষ্ঠার) লক্ষ্য সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে আর যাতে তিনি (আ.) বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করেছেন। অনেক নবদীক্ষিত আহমদী এবং নবপ্রজন্মের আহমদীও এতে অংশগ্রহণ করে থাকবে যাদের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষায় এসব বিষয় (হয়তো) পৌঁছে নি; তাদের জন্যও এগুলো জানা জরুরি, যেন তারা ঈমান ও একীন এবং নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে উন্নতি করার চেষ্টা করে। এছাড়া (তারা যেন) আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য চেয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য এবং নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করে।

আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্য কী ছিল এবং এযুগে কেন এর প্রতিষ্ঠা আবশ্যক ছিল– এবিষয়ে বলতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "এ যুগ কতই না কল্যাণময় যুগ। এই বিপদসঙ্কুল যুগে আল্লাহ্ তা'লা একান্তই নিজ অনুগ্রহে মহানবী (সা.)-এর মহিমা প্রকাশের নিমিত্তে এই কল্যাণময় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অর্থাৎ অদৃশ্য হতে ইসলামের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন এবং এক জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই যারা ইসলামের জন্য নিজেদের হৃদয়ে এক প্রকার বেদনা অনুভব করে এবং যাদের হৃদয়ে এর সম্মান ও মাহাত্ম্য বিদ্যমান; তারা বলুক, এর চেয়ে ভয়াবহ কোনো যুগ ইসলামের ইতিহাসে অতিবাহিত হয়েছে কি যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে এত বেশি গালাগালি করা হয়েছে এবং এত অসম্মান করা হয়েছে আর এভাবে পবিত্র কুরআনের অবমাননা হয়েছে? মুসলমানদের এহেন অবস্থা দেখে আমার গভীর আক্ষেপ হয় আর আমি মর্মযাতনায় ভুগি। অনেক সময় আমি এই বেদনায় ব্যাকুল হয়ে যাই যে, এই অসম্মান অনুভব করার মতো চেতনাও কি এদের ভেতর অবশিষ্ট নেই? আল্লাহ্ তা'লা কি মহানবী (সা.)-এর সম্মানের প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ করেন না যে, এত গালি এবং অপলাপ শুনেও কোনো ঐশী জামা'ত প্রতিষ্ঠা করবেন না এবং এসব ইসলামবিরোধীর মুখ বন্ধ করে তাঁর মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা জগতময় ছড়িয়ে দিবেন না? যেখানে আল্লাহ্ এবং তাঁর ফিরিশতারা মহানবী (সা.)-

এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন সেখানে এমন অসম্মান ও অবমাননার যুগে এই সালাত তথা পরম অনুগ্রহের কত বেশি প্রয়োজন! আর এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪)

অতএব আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, আমাদের দায়িত্ব হলো নিজেদের অবস্থার সংশোধন করার পাশাপাশি মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা। বিশেষ করে এই দিনগুলোতে দরূদ পাঠের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত। আমরা যখন অধিক হারে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করব তখন আমরা সেই উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হব যা তিনি (আ.) মহানবী (সা.)-এর সম্মান ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বলেছেন।

আবার নিজ আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর হারানো আদর্শিক ঐতিহ্য পুনর্বহাল করা এবং কুরআনের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। এই সব কাজই হচ্ছে, কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তারা এটি দেখতে পায় না। অথচ এই জামা'ত এখন সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান আর এর নিদর্শনাবলীর এত বেশি সাক্ষী রয়েছে যে, তাদেরকে যদি এক জায়গায় একত্রিত করা হয় তাহলে তাদের সংখ্যা এত বেশি হবে যে, ভূপৃষ্ঠের কোনো বাদশারও এত সংখ্যক সৈন্য নেই। (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩-১৪)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ যে জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে হাজার হাজার আহমদী অংশগ্রহণ করছে তারাও এই নিদর্শনগুলোর মাঝে একটি। তিনি (আ.) বলেন, এই জামা'তের সত্যতার স্বপক্ষে এত বেশি নিদর্শন রয়েছে যে, এর সবগুলো বর্ণনা করাও সহজসাধ্য নয়। যেহেতু ইসলামের চরম অবমাননা করা হয়েছিল তাই আল্লাহ্ তা'লা এই অবমাননার প্রেক্ষিতেই এ জামা'তের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করেছেন।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, "এই যুগও আধ্যাত্মিক যুদ্ধের যুগ। শয়তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। শয়তান তার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতারণার মাধ্যমে ইসলামের দুর্গে আক্রমণ রচনা করছে এবং সে ইসলামকে পরাজিত করতে চায়। কিন্তু খোদা তা'লা এখন শয়তানের এই সর্বশেষ যুদ্ধে তাকে চিরতরে পরাজিত করার জন্য এই জামা'তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।" [মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬, নবসংস্করণ, রাবওয়া হতে প্রকাশিত]

অতএব এ বিষয়টি সকল আহমদীকে নিজ দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি (আ.) বলেন, "সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে একে সনাক্ত করে। পুণ্য লাভের সময় খুব স্বল্প রয়ে গেছে, কিন্তু অচিরেই সেই সময় ঘনিয়ে আসছে যখন আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তের সত্যতাকে সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করবেন। সেটি এমন সময় হবে যখন ঈমান পুণ্যের কারণ হবে না আর তওবার দ্বার বন্ধ করার বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ দিবে। এখন আমার মান্যকারীদের বাহ্যত নিজের প্রবৃত্তির সাথে এক ভয়াবহ যুদ্ধ করতে হয়। সে দেখবে, অনেক সময় তাকে আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তার জাগতিক কাজকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে, তাকে গালাগালি শুনতে হবে, সে অভিসম্পাত শুনবে; কিন্তু এই সকল বিষয়ের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সে পাবে। কিন্তু যখন দ্বিতীয় যুগ আসবে, অর্থাৎ যখন সেই সময় আসবে তখন জগদ্বাসী এদিকে এমন দুর্বার গতিতে আকৃষ্ট হবে যেভাবে উঁচু টিলা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে, অর্থাৎ যখন উন্নতির যুগ আসবে (তখন এমনটি ঘটবে)। (যখন) কোনো অস্বীকারকারীই দৃষ্টিগোচর হবে না তখনকার স্বীকৃতি

কোন্ মানের হবে? [অর্থাৎ তখন ঈমান আনার কী মূল্য রয়েছে?] তখন ঈমান আনা বীরত্বের কাজ নয়। পুণ্য সব সময় দুঃখের যুগেই লাভ হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-কে মেনে নিয়ে মক্কার নেতৃত্ব ছেড়ে দেন তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এক বিরাট জনগোষ্ঠির রাজত্ব দান করেন। আবার হযরত উমর (রা.)-ও যখন কম্বল পরিধান করে নেন এবং "হারচে বাদা বাদ মা কিশতি দার আব আন্দাখতিম" অর্থাৎ 'নৌকা পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছি, এখন যা হবার হবে' (প্রবাদের) সত্যায়ন করে মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করেন, তখন কি খোদা তা'লা তাঁর প্রতিদানের কোনো অংশ দিতে বাকি রেখেছেন? মোটেও না। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার জন্য সামান্য প্রচেষ্টাও করে সে এর প্রতিদান না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না। এখানে শর্ত হলো চেষ্টা করা। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি খোদার পানে সামান্য গতিতে অগ্রসর হয় আল্লাহ্ তার দিকে ছুটে আসেন। গোপন অবস্থায় মানার নামই তো ঈমান। যে হেলাল তথা নতুন চাঁদ দেখতে পায় সে প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন আখ্যায়িত হয়। অর্থাৎ যে প্রথম রাতের চাঁদ দেখতে পায় তাকে প্রখর দৃষ্টির অধিকারী আখ্যায়িত করা হয়, কিন্তু চতুর্দশীর চাঁদ দেখে যে 'আমি চাঁদ দেখেছি, আমি চাঁদ দেখেছি' বলে হইচই করবে তাকে তো পাগল বলা হবে।" (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫-২৬, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অতএব সৌভাগ্যবান হলেন সেসব লোক যারা আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করছেন এবং বিরোধীতার মখোমুখি হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করছেন। শুধু মেনে নেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং মূল উদ্দেশ্য হলো এক পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হওয়া এবং নিষ্ঠাবান একত্ববাদী মানুষ হওয়া; আর তখনই আল্লাহ্ তা'লার কৃপা বৃদ্ধি পেতে থাকে– এবিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর পথের সন্ধানে সচেষ্ট থাকে এবং তাঁর কাছে এ সমস্যার সমাধানের জন্য দোয়া করে তাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বিধান وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ যারা আমাদের মাঝে বিলীন হয়ে চেষ্টা করে আমরা তাদেরকে নিজেদের পথ দেখিয়ে দিই (সূরা আন কাবূত : ৭০)– অনুযায়ী নিজে হাতে ধরে পথ দেখিয়ে দেন আর তাকে আত্মিক প্রশান্তি দান করেন। কিন্তু মানুষের হৃদয়ই যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, দোয়াতে অনীহা থাকে এবং বিশ্বাস শির্ক ও বিদআতে কলুষিত থাকে, তবে সেটি আবার কিসের দোয়া আর সেই যাচনাই বা কেমন যাচনা যা সুফল বয়ে আনবে? যতক্ষণ মানুষ পবিত্র হৃদয় এবং সততা ও নিষ্ঠার সাথে সকল অবৈধ পথ ও কামনার দ্বার নিজের জন্য বন্ধ করে কেবল খোদার সামনেই হাত না পাতে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন লাভের যোগ্য হয় না। কিন্তু যখন সে কেবল আল্লাহ্ তা'লার দরবারেই সিজদাবনত হয় আর তাঁর কাছেই দোয়া করে তখন তার এ অবস্থা (ঐশী) সাহায্য ও রহমতকে আকর্ষণকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আকাশ থেকে মানব হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত দেখে থাকেন, আর যদি (তার হৃদয়ের) কোনো গভীর কোণেও কোনো ধরনের অন্ধকার, শির্ক বা বিদআতের কোনো অংশ বিদ্যমান থাকে তাহলে তার দোয়া এবং ইবাদতকে তার মুখে ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু যদি দেখেন, তার হৃদয় সকল প্রকার কামনা বাসনা ও অমানিশা থেকে পুরোপুরি পবিত্র তাহলে তার জন্য রহমতের দ্বার খুলে দেন আর তাকে স্বীয় (রহমতের) ছায়ায় আশ্রয় দিয়ে তার লালনপালনের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। **(মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৬-৩৯৭, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

তিনি (আ.) বলেন, "এই জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অথচ এখানে আমরা দেখছি, এমন অনেক লোক আসে যাদের উদ্দেশ্যই থাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি। স্বার্থসিদ্ধি হলে তো ভালো নয়তো কীসের ধর্ম, কীসের ঈমান!" (মলফূযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৭, ১৯৮৫ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত) কিছু কিছু লোক নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই বয়আত করে থাকে। আরেক স্থানে এর বিশদ ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, "প্রবৃত্তির কামনা বাসনাও (এক ধরনের) শির্ক হয়ে থাকে; এটি হৃদয়কে পর্দাবৃত করে। মানুষ যদি বয়আত করেও থাকে, তবুও সে হোঁচট খেতে পারে। আমাদের জামা'তের (শিক্ষা হলো), মানুষ যেন প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে পরিহার করে খাঁটি একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা যেন তার সত্যকে লাভ করা হয়, অন্যথায় তার প্রত্যাশিত বিষয় লাভ না হলেই দেখা যাবে সে পৃথক হয়ে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কি ধনসম্পদে উন্নতি করার জন্য মহানবী (সা.)-কে গ্রহণ করেছিলেন? না! তিনি (আ.) বলেন, সাহাবীদের জীবনচরিতে দৃষ্টিপাত করলে তাদের মাঝে এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না; তারা ঘুণাক্ষরেও এমনটি করেন নি। আমাদের বয়আত তো তওবার বয়আত, তাদের (অর্থাৎ সাহাবীদের) বয়আত ছিল মৃত্যুর শর্তে বয়আত। সম্প্রতি আমি বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছি আর সাহাবীদের ওপর খুতবার দীর্ঘ ধারা অব্যাহত ছিল। এসব খুতবায় আলোচিত হয়েছে, কীভাবে তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেন। একদিকে তারা বয়আত করতেন আর অপরদিক নিজেদের সব সহায়-সম্পদ, সম্মান, মর্যাদা, জান ও মাল হতে রিক্তহস্ত হয়ে যেতেন যেন তারা কোনো কিছুরই মালিক নন, আর এভাবে তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগতিকতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। সকল প্রকার সম্মান ও মর্যাদা এবং ঐশ্বর্য অর্জনের আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যেত। কে এমন চিন্তা করত যে, আমরা বাদশাহ হব বা কোনো দেশ জয় করব? এসব বিষয় তাদের চিন্তা ও কল্পনাতেও ছিল না বরং তারা তো সব ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়ে যেতেন আর সর্বদা খোদা তা'লার রাস্তায় সব দুঃখ ও কষ্টকে সানন্দে সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন, এমনকি প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতেন। তাদের নিজেদের অবস্থা তো এমনই ছিল যে, তারা এই জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যে তাদের পুরস্কৃত করেছেন বা তাদেরকে দান করেছেন আর যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাদেরকে অফুরন্ত নেয়ামতে ভূষিত করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।" **[মলফূযাত, ৩য় খন্ড, পৃ: ২৮৬, টীকা, নবসংস্করণ, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত]**

জামা'ত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা– এ প্রসঙ্গে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, খোদা তা'লাকে ভালোবাসার অর্থ কী? এর অর্থ হলো, নিজ পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান এবং নিজ সত্তার, মোটকথা সবকিছুর ওপর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে, **فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাকে এমনভাবে স্মরণ কর যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ কর বরং তার চেয়েও অধিক এবং প্রগাঢ় ভালোসার সাথে স্মরণ কর। এখন এখানে এবিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে এ শিক্ষা দেন নি যে, তোমরা খোদাকে পিতা বলে সম্বোধন কর; বরং এমনটি শেখানোর উদ্দেশ্য হলো, তোমরা যেন খ্রিষ্টানদের ন্যায় বিভ্রান্ত না হও আর খোদাকে যেন পিতা বলে ডাকা না হয়। আর যদি কেউ বলে, তাহলে তো পিতার চেয়ে নিম্নমানের

ভালোবাসা হলো– তবে সেই আপত্তির খণ্ডন করার জন্য أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا শব্দমালা জুড়ে দিয়েছেন। যদি أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا শব্দমালা না থাকতো তাহলে আপত্তির সুযোগ ছিল, কিন্তু এখন এ বাক্য সেই সমস্যারও সমাধান করে দিয়েছে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতি এমন ভালোবাসাই একজন মু'মিনের হৃদয়ে থাকা উচিত, অর্থাৎ জাগতিক সকল আত্মীয়তার ঊর্ধ্বে যেন খোদার ভালোবাসা স্থান পায়। আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, আমরা কি আমাদের মাঝে এই ভালোবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি? কিংবা আমাদের হৃদয়ে কি এজন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা রয়েছে?

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভালোবাসার আরো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এবং এর মানদণ্ড বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, প্রকৃত একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক হলো খোদা তা'লার পূর্ণ ভালোবাসা লাভ করা, আর এই ভালোবাসা ততক্ষণ সাব্যস্ত হতে পারে না যতক্ষণ ব্যবহারিক কর্ম পূর্ণাঙ্গীন না হবে। নিছক মৌখিক দাবির জোরে এটি প্রমাণিত হয় না। কেউ যদি মিছরির [অর্থাৎ চিনি বা গুড়ের] নাম উচ্চারণ করে, সেক্ষেত্রে নাম নিলেই কখনো মিষ্টি হয়ে যায় না; নাম নেয়ার ফলে মিষ্টি খাওয়া হয়ে যায় না। অথবা কেউ যদি মুখে কারো বন্ধুত্বের দাবি করে, স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু বিপদ বা প্রয়োজনের সময় তার সাহায্য ও সহযোগিতা না করে পাশ কাটিয়ে চলে যায় তাহলে সেই বন্ধু সত্যবাদী আখ্যায়িত হতে পারে না। তেমনিভাবে খোদা তা'লার একত্ববাদের যদি নিছক মৌখিক দাবি থাকে এবং ভালোবাসার দাবিও বুলিসর্বস্ব হয়ে থাকে তবে কোনো লাভ নেই, বরং এটি মৌখিক দাবির চেয়ে কার্যত করে দেখানোর অধিক দাবি রাখে। এর অর্থ এমন নয় যে, মৌখিক স্বীকারোক্তির কোনো মূল্যই নেই। না; আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, মৌখিক স্বীকারোক্তির পাশাপাশি ব্যবহারিক সত্যায়ন আবশ্যক। এজন্য খোদা তা'লার পথে তোমাদের নিজেদের জীবন উৎসর্গ করা আবশ্যক। অর্থাৎ সকল বিষয়ের ওপর খোদা তা'লাকে অগ্রগণ্য করা, সব বিষয়ের ওপর তাঁর নির্দেশাবলীকে প্রাধান্য দেয়া, তাঁর প্রেরিত ধর্মকে সকল বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়া। তিনি (আ.) বলেন, আর এটিই ইসলাম, এটিই সেই উদ্দেশ্য যে কারণে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব যে এখন এই ঝরনার নিকট না আসে যা খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করেছেন সে নিঃসন্দেহে বঞ্চিত থাকবে। যদি কিছু নিতে হয় এবং লক্ষ্য অর্জন করতে হয় তাহলে সত্যিকার অনুসন্ধানীর উচিত এই ঝরনার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং সম্মুখে পা বাড়ানো আর এই প্রবাহমান ঝরনার কিনারায় তার মুখ রাখা। কিন্তু এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ অন্যদের সাথে সম্পর্কের জামা খুলে ফেলে নিজ প্রভুর আস্তানায় বিনত না হবে আর এই অঙ্গীকার না করবে যে, পার্থিব সম্মান বিনষ্ট হলেও এবং বিপদাপদের পাহাড় ভেঙে পড়লেও খোদাকে পরিত্যাগ করবে না। যা-ই হোক, আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করা যাবে না, আর খোদা তা'লার পথে সব ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবে। ইব্রাহীম (আ.)-এর অসাধারণ নিষ্ঠা এটিই ছিল যে, তিনি নিজ পুত্রকে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো অনেক ইব্রাহীম সৃষ্টি করা। অতএব তোমাদের প্রত্যেকের উচিত ইব্রাহীম হওয়ার চেষ্টা করা। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি যে, ওলী হও, ওলীর ভক্ত হয়ো না; পীর হও, পীর-পূজারি হয়ো না। তোমরা সেসব পথ ধরে এসো, নিঃসন্দেহে সেগুলো সংকীর্ণ পথ। [অর্থাৎ নিজেকে এই মানের মানুষ বানাও। পীর-মুরিদী (প্রথা) আরম্ভ করে দিবে এমন নয়, বরং নিজেকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যাও যেখানে পৌঁছলে ওলী আখ্যায়িত হওয়া যায়, যে স্তরে (পৌঁছলে)

মানুষ বলবে, হ্যাঁ! এই ব্যক্তি এমন যিনি সৎকর্ম করেন, তার অনুসরণ করা উচিত]। তিনি (আ.) বলেন, তোমরা সেসব পথ ধরে এসো, নিঃসন্দেহে সেগুলো সংকীর্ণ পথ, কিন্তু সেগুলোতে প্রবেশ করে প্রশান্তি ও আরাম লাভ হয়। তবে এই দরজা দিয়ে একদম হালকা হয়ে অতিক্রম করা আবশ্যক। মাথায় যদি অনেক বড় বোঝা থাকে তাহলে তো বিপদ! [অর্থাৎ জাগতিক কামনা বাসনা এবং জাগতিক স্বার্থের বোঝা যদি মাথায় চাপানো থাকে আর জগৎ অগ্রগণ্য এবং ধর্ম পশ্চাতে থাকে তাহলে এ পথ দিয়ে অতিক্রম করা খুব কঠিন।] যদি অতিক্রম করতে চাও তাহলে এই বোঝা যা জাগতিক সম্পর্ক এবং জগৎকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দেয়ার বোঁচকা, তা ছুঁড়ে ফেলে দাও। আমাদের জামা'ত যদি খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চায় তাহলে তাদের উচিত সেটিকে ছুঁড়ে ফেলা। তোমরা নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো, তোমাদের মাঝে যদি বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা না থাকে তাহলে তোমরা মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত হবে এবং খোদা তা'লার সমীপে সত্যবাদী হতে পারবে না। এমতাবস্থায় শত্রুর পূর্বে সে ধ্বংস হবে যে বিশ্বস্ততাকে পরিত্যাগ করে বিশ্বাসঘাতকতাকে অবলম্বন করে। খোদা তা'লা প্রতারিত হন না আর তাঁকে কেউ প্রতারিত করতেও পারে না। তাই আবশ্যিক বিষয় হলো তোমরা সত্যিকার নিষ্ঠা ও সততা সৃষ্টি কর। **(মলফূযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৮-১৯০, মুদ্রণ : ১৯৮৪)**

এরপর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রেমাস্পদের সাথেও ভালোবাসার সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আপন একত্ববাদের পথ দেখিয়েছেন। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক এবং তাঁর সম্মান ও মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, মহানবী (সা.)-এর নবুওয়্যত ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষেই আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। অন্য (এমন) লোকদের উদাহরণ দিতে গিয়ে যারা পীর পূজায় মত্ত, কবর পূজারি আবার একই সাথে এ দাবিও করে যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় বিলীন, আর যারা আমাদের কাফের বলে তারা এই ঘোষণা দেয়, আহমদীরা মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করেছে, নাউযুবিল্লাহ্; অতএব এদের সর্ম্পকে তিনি (আ.) বলেন, এক ব্যক্তি যদি কারো প্রেমিক হওয়ার দাবি করে আর তার মত প্রেমাস্পদ যদি আরো হাজার হাজার থাকে সেক্ষেত্রে তার ভালোবাসা ও প্রেমের বিশেষত্ব কী রইল? অর্থাৎ এক লোক যদি কারো প্রেমিক হওয়ার দাবি করে আর একই সাথে সে আরো অনেক প্রেমাস্পদ বানিয়ে রাখে তাহলে যাকে সে ভালোবাসছে তার কী বিশেষত্ব থাকে? কাজেই এসব লোক যারা মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসার দাবি করে তারা যদি সত্যিই মহানবী (সা.)-এর প্রেমে বিভোর হয়ে থাকে যেমনটি তারা দাবি করে, তাহলে হাজার হাজার খানকা এবং মাজারের পূজা করার কারণ কী? অনেক খানকা এবং মাজার রয়েছে যেখানে এরা যায়, উপঢৌকন দেয়, দোয়া করে, এমনকি সিজদাও করে ফেলে। তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র মদীনায় যায় ঠিকই, কিন্তু আজমীর এবং অন্যান্য খানকায় খালি পা ও নগ্ন মাথায় যায়; পাকপতনের জানালা দিয়ে অতিক্রম করাই মুক্তির জন্য যথেষ্ট বলে মনে করে। কেউ কোনো পতাকা টাঙিয়ে রেখেছে, কেউ অন্য কোনো রীতি অবলম্বন করেছে। তাদের ওরশ এবং মেলা দেখে একজন প্রকৃত মুসলমানের হৃদয় (একথা ভেবে) কেঁপে ওঠে যে, এরা এসব কী করছে? উপমহাদেশ, (অর্থাৎ) ভারত ও পাকিস্তানে এসব বিষয় অহরহই দেখা যায়। ইসলামের জন্য যদি আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান না থাকত এবং إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ যদি খোদা তা'লার বাণী না হত আর তিনি যদি একথা না বলতেন যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ তাহলে

নিঃসন্দেহে আজ ইসলামের এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল যে, এটি ধ্বংস হওয়ার বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার আত্মাভিমান উদ্বেলিত হয়েছে আর তাঁর রহমত এবং সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি চেয়েছে যেন মহানবী (সা.)-এর বুরুজকে পুনরায় অবতীর্ণ করে এ যুগে তাঁর নবুওয়্যতকে নবরূপে জীবিত করে দেখায়। এজন্য তিনি এই জামা'তকে প্রতিষ্ঠা করেছেন আর আমাকে প্রত্যাদিষ্ট এবং মাহদীরূপে প্রেরণ করছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাকে প্রত্যাদিষ্ট এবং মাহদীরূপে প্রেরণ করছেন।

অতএব আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হলো আর কেবল তবেই আমরা আমাদের বয়আতের দাবি পূরণ করতে পারব যখন আমরা আমাদের ও অন্যদের মাঝে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি করে দেখাব এবং খোদার প্রতি ভালোবাসা আর রসূলপ্রেমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করব, নিজেদের জিহ্বাকে তসবিহ, তাহমীদ ও দরূদের মাধ্যমে সিক্ত রাখার চেষ্টা করব। সাহাবীদের আদর্শ অবলম্বন করা এবং তাদের মত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা যখন এ জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর এর সমর্থনে শত শত নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন তখন এর মাধ্যমে তিনি চেয়েছেন, এ জামা'ত যেন সাহাবীদের জামা'ত হয় আর এরপর যেন খায়রুল কুরুনের যুগ তথা শ্রেষ্ঠ শতাব্দী এসে যায়। যেসব লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয় তারা যেহেতু وَآخَرِينَ مِنْهُمْ-এ অন্তর্ভুক্ত হয় তাই তারা যেন মিথ্যা কার্যকলাপের পোশাক খুলে ফেলে। আহমদী হওয়ার জন্য মিথ্যা কার্যকলাপ বাদ দেয়া উচিত। আর (তারা যেন) তাদের পূর্ণ মনোযোগ খোদা তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করে এবং **ফায়জে আ'ওয়ায** তথা বক্র যুগের শত্রু হয়। ইসলামে তিনটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে। একটি হচ্ছে কুরুনে সালাসা, এরপর ফায়জে আ'ওয়াজ তথা বক্রতার যুগ, যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, **'লায়সু মিন্নি ওয়া লাসতু মিনহুম'**। অর্থাৎ তারাও আমার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না আর আমিও তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখি না। আর তৃতীয় যুগ হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্র যুগ যা মহানবী (সা.)-এর যুগের সাথেই সম্পৃক্ত, বরং প্রকৃতপক্ষে এটি মহানবী (সা.)-এরই যুগ। ফায়জে আ'ওয়াজের কথা যদি মহানবী (সা.) না-ও বলতেন তাহলেও এই কুরআন শরীফ আমাদের হাতে রয়েছে আর وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, এমন কোনো যুগও আছে যা সাহাবীদের রীতিনীতির পরিপন্থি। অর্থাৎ তাদের কাজ সাহাবীদের থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করছে যে, এই হাজার বছরের মাঝে ইসলাম (ধর্ম) বহুবিধ সমস্যা ও বিপদাপদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। ধর্ম বিকৃত হতে থেকেছে। স্বল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত সবাই ইসলাম পরিত্যাগ করে এবং মু'তাযেলা, আবাহিয়া ইত্যাদি বহু ফিরকা সৃষ্টি হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমরা এ বিষয়টি স্বীকার করি যে, এমন কোনো যুগ অতিক্রান্ত হয় নি যে যুগে ইসলামের কল্যাণের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু সেই মধ্যবর্তী যুগে যেসকল ওলী আউলিয়া অতিক্রান্ত হয়েছেন তাদের সংখ্যা এতটাই কম ছিল যে, সেই কোটি কোটি মানুষ যারা সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হয়ে ইসলাম থেকে দূরে ছিটকে পড়েছিল তাদের বিপরীতে তারা (সংখ্যায় তেমন) কিছুই ছিলেন না। তাই মহানবী (সা.) নবীর দৃষ্টিতে এ যুগকে দেখেছেন এবং এর নাম দিয়েছেন **ফায়জে আ'ওয়ায** তথা বক্রতার যুগ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এখন আরেকটি বিশাল জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছেন যারা সাহাবীদের দল বলে আখ্যায়িত হবে। কিন্তু যেহেতু খোদা তা'লার বিধান হলো, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত ধারাবাহিকভাবে উন্নতি লাভ করে, তাই

আমাদের জামা'তের উন্নতিও ধাপে ধাপে এবং **'কাযার'ইন'** অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের ন্যায় হবে। যেভাবে শস্যক্ষেত্র ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ঠিক সেভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সেই বীজের ন্যায় যা ভূমিতে বপন করা হয়। সেই সমস্ত সুউচ্চ মর্যাদা ও লক্ষ্য যেখানে আল্লাহ্ তা'লা একে উপনীত করতে চান তা এখনো অনেক দূর। তা (ততক্ষণ) পর্যন্ত অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ না সেসব গুণাবলী সৃষ্টি হবে যা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়। একত্ববাদের স্বীকারোক্তির মাঝেও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে, এক বিশেষ রূপের তাবাত্তুল ইলাল্লাহ্ (একনিষ্ঠভাবে খোদামুখী হওয়া) থাকতে হবে, যিকরে ইলাহী (তথা আল্লাহ্‌র স্মরণ)-এ এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এবং নিজ ভাইয়ের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

অতএব এগুলো হলো আমাদের উদ্দেশ্য যেগুলো অর্জনের জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত আর তখনই আমরা জামা'তের বিভিন্ন উন্নতি দেখতে পাব।

এছাড়া বিশেষ মনোযোগ এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারে পবিত্র কুরআন পাঠ করার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রাখতে হবে, পবিত্র কুরআন পূর্ববর্তী (ঐশী) কিতাবসমূহ এবং নবীদের ওপর অনুগ্রহ করেছে। তাদের শিক্ষা যা কাহিনীর মত ছিল (সেগুলোকে) জ্ঞানের আদলে উপস্থাপন করেছে। আমি সত্যিই বলছি, কোনো ব্যক্তিই এসব কিচ্ছাকাহিনী দ্বারা মুক্তি পেতে পারে না যতক্ষণ না সে পবিত্র কুরআন পাঠ করবে। কেননা পবিত্র কুরআনের অনন্য বিশেষত্ব হলো 'ইন্নাহু লাকাউলুল ফাসলুন, ওয়ামা হুয়া বিলহাযল' অর্থাৎ সুনিশ্চিতভাবে এটি একটি মীমাংসিত ঐশীবাণী এবং আদৌ কোনো নিরর্থক কথা নয়। এটি হলো মানদণ্ড, তত্ত্বাবধায়ক, জ্যোতি, আরোগ্য এবং রহমত। যারা পবিত্র কুরআন পাঠ করে একে কল্পকাহিনী মনে করে তারা আসলে কুরআন পড়ে নি বরং এর অসম্মান করেছে। আমাদের বিরোধীরা আমাদের বিরোধিতায় কীভাবে এতটা ক্ষিপ্র হয়েছে? তা কেবল এ জন্য যে, আমরা পবিত্র কুরআনকে ঠিক সেভাবে (উপস্থাপন করে) দেখাতে চাই যেভাবে খোদা তা'লা বলেছেন, এটি সুস্পষ্ট জ্যোতি, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞান অথচ তারা চেষ্টা করে পবিত্র কুরআনকে একটি সাধারণ কিচ্ছাকাহিনীর চেয়ে অধিক গুরুত্ব না দেয়ার। আমরা এটি সহ্য করতে পারি না। খোদা তা'লা নিজ কৃপায় আমাদের কাছে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআন একটি জীবন্ত ও উজ্জ্বল (ঐশী) কিতাব। তাই আমরা এর বিরোধিতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ কেন করব? মোটকথা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখে তাদেরকে আমি বার বার উপদেশ দিয়ে বলে থাকি, খোদা তা'লা এই জামা'তকে প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর এ বিষয়টি আমরা কুরআন পড়েই বুঝতে পারি। এর সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি আমরা পবিত্র কুরআন থেকেই লাভ করতে পারি। কেননা এটি ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে কোনো নূর সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু আমি চাই, বাস্তব সত্যের মাধ্যমে ইসলামের গুণ জগতে প্রকাশিত হোক যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে এ কাজের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। তাই অধিক হারে পবিত্র কুরআন পাঠ কর, কিন্তু কেবল কিচ্ছাকাহিনী মনে করে নয় বরং একটি দর্শন মনে করে (এটি পাঠ কর)।

অতএব এর অর্থ, মর্ম ও তফসীরের প্রতি প্রত্যেক আহমদীর দৃষ্টি দেয়া উচিত। এরপর পুণ্যকর্মের দিকে আরো মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে এবং এই পুণ্যকর্মের সংজ্ঞা কী (তা বলতে গিয়ে) তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা ঈমানের সাথে

আমলে সালেহ্ বা সৎকর্মকেও সংযুক্ত করেছেন। বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি বা ঘাটতি না থাকাই হলো আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম। স্মরণ রেখো! মানুষের কর্মে সর্বদা চোর হানা দেয়– তা কী? সেটি কোন্ চোর? সেগুলো হলো লৌকিকতা, অর্থাৎ মানুষ যখন একটি কাজ লোকদেখানোর জন্য করে; আত্মশ্লাঘা, অর্থাৎ কোনো কাজ করে মনে মনে উল্লসিত হয়ে ভাবে, আমি অনেক ভালো কাজ করেছি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মন্দকর্ম ও পাপ তার দ্বারা সম্পাদিত হয়। এ সবই চোর। এর ফলে মানুষের কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। আমলে সালেহ্ বা সৎকর্ম হলো তা যাতে যুলুম, আত্মশ্লাঘা, লৌকিকতা, অহংকার এবং মানুষের অধিকার হরণের কল্পনাও থাকে না। সৎকর্ম দ্বারা যেভাবে পরকালে রক্ষা পাওয়া যায় একইভাবে এ জগতেও রক্ষা পাওয়া যায়। পুরো বাড়িতে যদি এক ব্যক্তিও সৎকর্মপরায়ণ থাকে তাহলে পুরো বাড়ি রক্ষা পায়। জেনে রেখো! তোমাদের মাঝে যদি সৎকর্ম না থাকে তবে শুধু মান্য করা কোনো কাজে আসবে না। একজন চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র লিখে দেয়ার অর্থ হলো তাতে যা লেখা থাকে তা সংগ্রহ করে সেবন করা। সে যদি এসব ঔষধ সেবন না করে শুধু ব্যবস্থাপত্র নিজের কাছে রেখে দেয়, তাহলে তার কী লাভ হবে?"

অতএব আমাদের এখন দায়িত্ব হলো তাঁর (আ.) উপদেশ মেনে কাজ করা। এটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। অন্যথায় বয়আত গ্রহণের কোনো মূল্য নেই। তিনি (আ.) বলেন, "এখন তোমরা তওবা করেছ, তাই ভবিষ্যতে খোদা তা'লা দেখতে চান, এই তওবার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের নিজেদের কতটা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করেছ? এখন সেই যুগ এসে গেছে যখন আল্লাহ্ তা'লা তাকওয়ার মাধ্যমে পার্থক্য করতে চান। অনেকে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আর নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই করে না। মানুষের আভ্যন্তরীণ অমানিশাই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, অন্যথায় খোদা তা'লা তো খুবই দয়ালু ও কৃপালু। কিছু মানুষ এমন রয়েছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিত থাকে আর কিছু লোক এমনও আছে যারা পাপ সম্পর্কে অবহিতও থাকে না। এ জন্যই আল্লাহ তা'লা স্থায়ীভাবে ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করিয়েছেন।" জানা নেই, মানুষ কখন কী কথা বলে বসে যা পাপ বলে গণ্য হয়। "কাজেই সব সময় ইস্তেগফার করতে থাকা উচিত যেন মানুষ সকল পাপের জন্য তা হোক বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ, সে তা জানুক বা না জানুক এবং হাত, পা, মুখ, নাক, কান, চোখ এক কথায় সকল প্রকার পাপ থেকে ইস্তেগফার করতে থাকে। আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়াটি বেশি বেশি পড়া উচিত।" তিনি (আ.) বলেন, আদম (আ.)-এর দোয়া পড়। আর সেটি কোন্ দোয়া? তা হলো, **رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ** (সূরা আল আ'রাফ : ২৪) এই দোয়া আদিতেই গৃহীত হয়েছে। উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিত করবে না। যে ব্যক্তি উদাসীনতায় জীবন অতিবাহিত করে না, আশা করা যায় সে (সহ্য) ক্ষমতার ঊর্ধ্বে কোনো বিপদে নিপতিত হবে না। আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদই আপতিত হয় না। যেভাবে আমার প্রতি এই দোয়া ইলহাম হয়েছে যে, **رب كل شيء خادمك رب فاحفظني وانصرني وارحمني** তিনি (আ.) বলেন, এ দোয়াও পড়। **(মলফূযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৪-২৭৬, ১৯৮৪ সনে যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন,

স্মরণ রেখো! আত্মার পরিশুদ্ধতার মাধ্যমে বুদ্ধি তেজোদীপ্ত হয়। মানুষ আত্মাকে যত পরিশুদ্ধ করবে বুদ্ধি ততই তীক্ষ্ণ হয় আর (এ অবস্থায়) ফিরিশতা সামনে দাঁড়িয়ে তার সাহায্য করে, কিন্তু পাপী জীবনের অধিকারীদের মস্তিষ্কে আলো প্রবেশ করতে পারে না। তাকওয়া

অবলম্বন কর যেন খোদা তোমাদের সহায় হন। সত্যবাদীর সাহচর্যে থাক যেন তোমার নিকট তাকওয়ার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হয় এবং তুমি সামর্থ্য লাভ কর। এটাই আমাদের মূল অভিপ্রায় আর একেই আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

তিনি (আ.) বলেন, আমার জামা'তের সর্বদা এই উপদেশ স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা যেন এ বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখে যা আমি বর্ণনা করে থাকি। সর্বক্ষণই আমার যদি কোনো চিন্তা হয় তবে তা হলো, পৃথিবীতে তো (বৈবাহিক) সম্পর্ক তৈরি হয়েই থাকে। এগুলোর কিছু সৌন্দর্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে, কিছু হয়ে থাকে বংশ কিংবা ধনসম্পদের দৃষ্টিকোণ থেকে আর আর কিছু হয়ে থাকে শক্তি সামর্থ্যের ভিত্তিতে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে এসব বিষয়ের কোনো মূল্য নেই। তিনি তো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন **'ইন্না আকরামাকুম ইন্‌দাল্লাহে আতক্বাকুম'** অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিই সম্মানিত ও মর্যাদাবান যে মুত্তাকী। এখন যে জামা'ত তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত খোদা সেটিকেই অবশিষ্ট রাখবেন আর অন্যদের ধ্বংস করবেন। এটি খুবই স্পর্শকাতর স্থান আর এখানে একসাথে দুজন দণ্ডায়মান হতে পারে না, অর্থাৎ মুত্তাকীও সেখানে থাকবে আর পাপাচারী ও অপবিত্র ব্যক্তিও সেখানে থাকবে। এটি নিশ্চিত যে, মুত্তাকী (সেখানে) দাঁড়িয়ে থাকবে আর মন্দদের ধ্বংস করা হবে। কিন্তু যেহেতু একমাত্র খোদা তা'লাই ভালো জানেন তাঁর দৃষ্টিতে কে মুত্তাকী, তাই এটি অত্যন্ত ভীতির স্থান। সে-ই সৌভাগ্যবান যে মুত্তাকী আর হতাভাগা হলো সে যে অভিশপ্ত হয়েছে। **(মলফূযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭৭, ২০০৩ সনে রাবওয়া থেকে মুদ্রিত)**

অতএব সর্বদা আমাদের উচিত তওবা, এস্তেগফার এবং আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে থাকার আর শয়তান থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে থাকা।

তিনি (আ.) বলেন, "এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তোমরা এক ভিন্ন সত্তায় পরিণত হও আর সম্পূর্ণরূপে তোমরা এক নতুন জীবনযাপনকারী মানুষ হয়ে যাও। তোমরা পূর্বে যা ছিলে তা থেকো না। এটি মনে করো না যে, খোদা তা'লার পথে নিজেদের পরিবর্তন করলে তোমরা মুখাপেক্ষী হয়ে যাবে বা তোমাদের অনেক শত্রু হবে। না, আল্লাহ্‌র আঁচল যে আঁকড়ে ধরে সে কখনোই মুখাপেক্ষী হয় না, সে কখনোই দুর্দিনের সম্মুখীন হয় না। খোদা তা'লা যার বন্ধু এবং সাহায্যকারী হয়ে যান গোটা পৃথিবীও তার শত্রু হয়ে গেলে কোনো সমস্যা নেই। মু'মিন বিপদাপদে নিপতিত হলেও কখনো সে কষ্ট পায় না। বরং সেই দিনগুলো তার জন্য জান্নাতের দিন হয়। খোদা তা'লার ফিরিশতারা তাকে মায়ের মতো করে কোলে তুলে নেয়। সারকথা হলো, খোদা তা'লা স্বয়ং তার সুরক্ষাকারী এবং সাহায্যকারী হয়ে যান। ইনি সেই খোদা যিনি **'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর'**, তিনি **'আলেমুল গায়েব'**, তিনি **'হাইয়্যুন কাইয়্যুম'**। এই খোদার আঁচল আঁকড়ে ধরলে কি কেউ কোনো কষ্ট পেতে পারে? কক্ষনো না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সত্যিকার বান্দাদের এমন মুহূর্তে রক্ষা করেন যা দেখে জগদ্বাসী বিস্মিত হয়ে যায়। আগুনে নিপতিত হওয়ার পরও হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জীবিত উদ্ধার পাওয়া কি জগদ্বাসীর জন্য বিস্ময়ের বিষয় ছিল না? ভয়ংকর ঝড়ের কবল থেকে হযরত নূহ (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথির নিরাপদে রক্ষা পাওয়া কি কোনো সামান্য বিষয় ছিল? এরূপ বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে আর খোদা তা'লা স্বয়ং এ যুগে তাঁর ঐশী কুদরতের অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন। দেখ! আমার বিরুদ্ধে হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলা দায়ের করা হয়েছে। অনেক বড় নামকরা এক ডাক্তার, যে একজন পাদরি– সে এতে বাদী হয় আর আর্যরা এবং কতক মুসলামানও তার সমর্থন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা-ই

হয়েছে যা খোদা তা'লা পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে, 'আব্রা', 'অর্থাৎ আমাকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে। এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সসম্মানে মুক্তি দান করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নসীহত এবং প্রত্যাশা অনুযায়ী নিজেদের জীবন অতিবাহিত করার তৌফিক দিন এবং আমরা যেন সত্যিকার অর্থেই নিজেদের জীবনে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধনকারী হতে পারি। জলসার এই দিনগুলোতে কাদিয়ানেও এবং অন্য যেসব দেশে জলসা হচ্ছে সেখানকার প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী যেন বিশেষ দোয়ার মাঝে নিজেদের সময় অতিবাহিত করে আর এই দোয়াও যেন করে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বয়আতের দাবি পূরণ করার তৌফিক দিন। অনুরূপভাবে পৃথিবীর প্রত্যেক আহমদী এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখুন যে, আমরা কি তেমন আহমদী হতে পেরেছি যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বানাতে চেয়েছেন অথবা নিজ জামা'তের কাছে প্রত্যাশা করেছেন? (এর উত্তর) যদি না হয়ে থাকে তাহলে এজন্য সর্বদা আমাদের চেষ্টা ও দোয়া করতে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। কয়েকটি জানাযা রয়েছে। একটি উপস্থিত জানাযা। [হুযূর (আই.) জিজ্ঞেস করেন, জানাযা কি এসে গেছে?] হাযের জানাযা হচ্ছে ফযল আহমদ ডোগর সাহেবের। তিনি জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের একজন কর্মী ছিলেন। তিনি চৌধুরী আল্লাহ্ দিত্তা ডোগর সাহেবের পুত্র ছিলেন। ২১ ডিসেম্বর তারিখে তিনি ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম ওসীয়্যতকারী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী উযমা ফযল সাহেবা এবং চার পুত্র ও তিন কন্যা রয়েছে। ১৯৯২ সালে তিনি এখানে, অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে চলে এসেছিলেন। এরপর তিনি নিজের কাজ করতে থাকেন আর তারপর ১৯৯৯ সালে তিনি জীবন উৎসর্গ করেন এবং খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কাছে নিজেকে উপস্থাপন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) দয়াপরবশ হয়ে তার ওয়াক্ফ গ্রহণ করেন এবং বেশ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ব্যক্তিগত সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে আমি তাকে যুক্তরাজ্যের জামেয়াতে নিযুক্তি প্রদান করি। তিনি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অতঃপর তাকে লাইব্রেরির ইনচার্জ বানানো হয়। এ পদে থেকেই তিনি আমৃত্যু দায়িত্ব পালনের তৌফিক পেয়েছেন। জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের লাইব্রেরি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি খুবই গুরুপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে প্রকাশিত রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্সের সকল সংস্করণ তিনি স্ক্যান করেছেন এবং সেগুলোর অনুলিপি তৈরী করে সেখানে রেখেছেন। রূহানী খাযায়েনের মূল সংস্করণও স্ক্যান করেছেন। সেগুলোরও অনুলিপি প্রস্তুত করেন।

তার সন্তানরা বর্ণনা করেছেন, তার বড় আশা ছিল তার সন্তানরা যেন আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সর্বদা যুক্ত থাকে এবং অনুগত থাকে। তিনি বলতেন, জামা'তের দায়িত্ব পালন থেকে মানুষ কখনো অবসর গ্রহণ করতে পারে না, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার নাম হচ্ছে ওয়াক্ফ। এছাড়া আমাকে দোয়া করার জন্য বলতেন যে, দোয়া কর আমি যেন শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা তার এ মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন এবং হাসপাতালে যাওয়ার দুই দিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করছিলেন। লাইব্রেরিতে গিয়ে কাজ করে এসেছেন।

জামেয়ার শিক্ষক হাফেয মাশহুদ সাহেব লিখেন, ফযল ডোগর সাহেবের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, তিনি খিলাফতের সত্যিকার প্রেমিক, বিশ্বস্ত এবং নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তাহলে এতে কোনো প্রকার অত্যুক্তি হবে না। এরপর তিনি আরো বলেন, ফযল ডোগর সাহেব সত্যিকারের ওয়াকেফে যিন্দেগী ছিলেন যাকে আমরা সর্বক্ষণ জামেয়া আহমদীয়ার লাইব্রেরিকে নিজ সন্তানের মতো গোছগাছ করে পরিপাটি করতে দেখেছি। পুরাতন পাণ্ডুলিপি এনে এনে সেগুলো স্ক্যান করতেন এবং সেগুলোকে চমৎকারভাবে বাঁধাই করিয়ে লাইব্রেরির শোভা বর্ধন করতেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিল তার অক্লান্ত পরিশ্রম যার ফলে এখন জামেয়া আহমদীয়ার লাইব্রেরিতে ২৫ হাজারের অধিক বইপুস্তক রয়েছে, অথচ উপকরণ খুবই সীমিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও তাঁর এক খুতবায় যা তিনি আমার পিতা সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের মৃত্যুর সময় প্রদান করেছিলেন তাতে তার কথা উল্লেখ করেছিলেন আর তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন এবং তার কার্যক্রমের প্রশংসা করেছিলেন।

সর্বদা জলসার দায়িত্ব পালন করেছেন। আমার সাথেও রাবওয়াতে জলসার দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বদা আমি তাকে অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে আর রাত-দিন একাকার করে কাজ করতে দেখেছি। তার অন্য কোনো চিন্তা থাকত না। তার জামাতা শাহেদ ইকবাল সাহেব, বর্তমান বা প্রাক্তন সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, সুইজারল্যান্ড; তিনি বলেন, যখনই কথা হতো সর্বদা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন, নামায পড়েছি কি-না। নামাযের বিষয়ে নসীহত করতেন আর এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন আর তার সন্তানদেরও সর্বদা জামা'ত ও খিলাফতের সাথে যুক্ত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা গায়েব হবে মালেক মনসূর আহমদ উমর সাহেবের, যিনি রাবওয়াতে মুরব্বী সিলসিলাহ্ ছিলেন। সম্প্রতি ৮০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি জামেয়া পাশ করেন। তারপর তিনি আরবি ফাযেল পরীক্ষাও পাশ করেন। ৭১ থেকে ৭৩ সালে তিনি ইসলামাবাদের নমল ইউনিভার্সিটি থেকে জার্মান ভাষায় ডিপ্লোমা করেন। শুরুতে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তার পদায়ন হয়। অতঃপর ১৯৭৪ সনের জানুয়ারি মাসে তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে জার্মানি প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি প্রায় দেড় বছর অবস্থান করেন। এরপর ফেরত এসে পুনরায় পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে তার পদায়ন হয়। পরবর্তীতে আবার ১৯৮৩ সনের অক্টোবর মাসে তাকে জার্মানি প্রেরণ করা হয় যেখানে তিনি ১৯৮৬ সন পর্যন্ত আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালনের তৌফিক লাভ করেন। ওই সময় তিনি অভিবাসনপ্রার্থী হিসেবে আগত লোকদের (জার্মান) ভাষাও শেখাতেন এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতাও করতেন। রিশতানাতা বিভাগেও তিনি কাজ করেছেন। জামেয়াতে জার্মান ভাষা পড়িয়েছেন। প্রায় ৪৬ বছর পর্যন্ত তিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার এক কন্যা ফায়েযা রঈস জাপানের মিশনারি ইনচার্জ মুনীস রঈস সাহেবের স্ত্রী এবং এক পুত্র সাবাহ্ উজ্ জাফর মালেক মুরব্বী সিলসিলাহ্। এছাড়া তার আরো সন্তানসন্ততি রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো গাম্বিয়ার মুয়াল্লিম সিলসিলাহ্ জনাব ঈসা জোসেফ সাহেবের। এটিও গায়েবানা জানাযা। সম্প্রতি ডিসেম্বর মাসে ৬১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। সেখানকার নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব লিখেন, (তিনি) অত্যন্ত সফল একজন মুবাল্লেগ ছিলেন। জামেয়া হতে পাশকৃতও ছিলেন না, কিন্তু জামা'তের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। এক সৈনিকের ন্যায় সর্বদা কাজ করতে প্রস্তুত থাকতেন। তিনি বলতেন, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেনাদলের একজন নগণ্য সৈনিক এবং জামা'ত তাকে যে আদেশই দিবে তা পালন করতে প্রস্তুত আছেন। জলসা ও অন্যান্য জামা'তী অনুষ্ঠানে তিনি সর্বদা নিজ জামা'তের সদস্যদের সাথে থাকতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, তাদের তরবিয়ত করতেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের আহমদীদের কুরবানীকে তিনি ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেন আর সবর্দা তাদের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের সম্মান করেন। খিলাফতের সাথে বিশেষ ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। দোয়ার জন্য নিয়মিত চিঠি লিখতেন আর যখন উত্তর পেতেন তখন খুবই আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে সেগুলোর উল্লেখ করতেন। তিনি তার সন্তানদের মাঝেও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন এবং সন্তাদেরও বলতেন, যুগ খলীফাকে (নিয়মিত) চিঠি লেখ।

সৈয়দ সাঈদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ্, বর্তমানে সিয়েরা লিওনে আছেন, তিনিও গাম্বিয়াতে ছিলেন। তিনি বলেন, তার জন্ম সেনেগালে হয়েছিল এবং এরপর চাকুরিসূত্রে অথবা পড়াশোনা শেষ করে তিনি গাম্বিয়া চলে আসেন এবং নাসের আহমদীয়া সেকেন্ডারি স্কুলে ফরাসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেই সময় তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন এবং পরে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় উন্নতি করতে থাকেন। ১৯৯৭ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে সকল কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা গাম্বিয়া ত্যাগ করলে তাকে নাসের আহমদীয়া সেকেন্ডারি স্কুলের প্রিন্সিপাল বানিয়ে দেয়া হয়। এ পদে (থেকে) তিনি অসামান্য সেবা প্রদান করেছেন। এরপর তাকে আঞ্চলিক মিশনারী বানিয়ে দেয়া হয় এবং আমৃত্যু তিনি এ পদে বহাল ছিলেন।

ঈসা জোসেফ সাহেবের মাধ্যমে অনেক তৃষ্ণার্ত আত্মা আহমদীয়াতের ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়। তার ধর্মীয় জ্ঞানও অনেক বেশি ছিল। তিনি নিজে অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করেছেন। অ-আহমদীদের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল, এ কারণে অধিকাংশ অঞ্চলের গোত্রপ্রধান ও ইমামরা তাকে অনেক সম্মান করতেন। এছাড়া কেউ (অত্র) অঞ্চলে আহমদীদের বিরোধিতা বা দুষ্টামি করতে চাইলে কখনো কখনো এসব ভদ্র প্রকৃতির লোক প্রতিরোধ করতেন এবং রুখে দাঁড়াতেন আর বিরোধীদের ব্যর্থতার মুখ দেখতে হতো।

তিনি আরো লিখেন, তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তার জ্ঞানের ব্যাপকতা। যেভাবে আমি বলেছি, তার পড়াশোনার পরিধি ব্যাপক ছিল আর জামা'তী বইপুস্তকের বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন। জলসা সালানায় বেশ কয়েকবার তিনি বক্তৃতা দেয়ারও সুযোগ পেয়েছেন। অনুরূপভাবে জামা'তী পত্রপত্রিকায় তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। বিনয় ও নম্রতা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি উত্তম পরামর্শদাতাও ছিলেন আর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে তাকে সর্বদা সম্পৃক্ত করা হতো। তার অধিকাংশ মতামত সঠিক হতো। তাহাজ্জুদ নামায এবং দোয়া করতে অভ্যস্ত ছিলেন, বহু সংখ্যায় সত্য স্বপ্ন দেখতেন। এছাড়া যখনই কেউ তাকে দোয়ার জন্য বলতো তখন তাকে পরামর্শ দিতেন যে, প্রথমে যুগ খলীফাকে দোয়ার জন্য পত্র লেখ; আর এরপর নিজেও দোয়া করতেন।

এরপর গাম্বিয়ার মুবাল্লিগ মাসুদ সাহেব বলেন, তবলীগের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল। কয়েক ঘন্টা সফর করে দূরদূরান্তের গ্রামে যেতেন। অত্যন্ত পবিত্রচেতা ও হাসিখুশি একজন মানুষ ছিলেন। আনন্দ হোক বা বেদনা, অসুস্থতা হোক বা দুশ্চিন্তা সর্বদা মুখে হাসি লেগে থাকত। সবার সাথে হাস্যবদনে সাক্ষাৎ করতেন। সবার সাথে এমন হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাৎ করতেন যে, সাক্ষাৎকারী ভাবতো তিনি কেবল আমাকেই ভালোবাসেন। খুবই দয়ালু, নম্র ও সদয় মানুষ ছিলেন। কখনো কারো গীবত করতেন না আর কারো বিষয়ে নাকও গলাতেন না। নিজ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অসাধারণ আনুগত্য করতেন। অধীনস্তদের প্রতি খেয়াল রাখতেন এবং তাদের সাহস যোগাতেন। তিনি বলেন, যখনই তার সম্পর্কে খোঁজ নিয়েছি বা যোগাযোগের চেষ্টা করেছি তখন জানা যেত যে, ছুটির দিনে তিনি তবলীগের জন্য বাহিরে আছেন। হোয়াটস্অ্যাপ স্ট্যাটাসে কুরআনের আয়াত, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের তবলীগি ও তরবিয়তী পোস্ট আর খলীফাদের ছবি প্রত্যহ রীতিমতো শেয়ার করতেন এবং আহমদী ও অ-আহমদী লোকদের প্রেরণ করতেন। তবলীগের অনেক আগ্রহ ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন। তার সন্তানদেরও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

যেমনটি আমি বলেছি, এখন জুমুআর নামাযের পর তাদের জানাযা পড়ানো হবে, ইনশাআল্লাহ্।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)